নজরদারি

সম্পাদনা

সুশান্ত পাল

পুনশ্চ

সূচিপত্র

প্রথম নজর		১১

শি শু শি ক্ষা ব য়ঃ স ন্ধি

প্রতিটি শিশুর প্রতি নজর	কুমার রাণা	১৩
উত্তরের জানালা আজও বন্ধ	সুস্মিতা পাল	১৯
ব্রিটিশ নজরদারির অধীনে উনিশ শতকের ভারতীয় শিক্ষা ও সাহিত্য	আরাত্রিকা গাঙ্গুলি	২২

ব্য ক্তি স ম ষ্টি প রি স র

আক্রান্ত যখন আমাদের ব্যক্তিগত পরিসর	মোহিত রণদীপ	২৮
নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ	পার্থ সারথি বণিক	৩৩
আমি যখন নজরদার	সুশান্ত পাল	৩৯

না রী ম ন প্রে ম যৌ ন তা

আমার শরীর আমার মন	নীলাব্জ নিয়োগী	৪২
লাভ জেহাদ: মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ	সেখ মহম্মদ ফারুক	৪৩
নজরদারি: মেয়ে মহল	নিবেদিতা সিংহ রায়	৪৮
যৌনতা যার যার,আমার যৌনতা আমার অধিকার	প্রীতম মাজী (প্রিয়ম)	৫২

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি পরিবীক্ষণ

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাট্য-নিয়ন্ত্রণ	রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১
নজর যখন গানে	শুভাশিস ভট্টাচার্য	৭৮
নজরদারি: রবীন্দ্র ভাবনায়	দেবাশিস মল্লিক	৯৬
নজরদারি: সাহিত্যে	সঞ্জীব দাস	১০০
বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে...	অমৃতেশ বিশ্বাস	১০৭
নজরদারি: সিনেমা	অরুণাভ গাঙ্গুলি	১১৬
নজরাধীন আমরা ও আমাদের খাদ্য-সংস্কৃতি	স্বাগতা রায়	১১৯
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজ: হলুদ সাংবাদিকতার আবহে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম	নীলাদ্রি নিয়োগী	১৩১
শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধির বাংলা সাহিত্যে লিঙ্গ-রাজনীতির নজরদারি	দূর্বা ব্যানার্জী	১৪৪
মাদারিং এ মুসলিম: একটি আন্তরিক সহজপাঠ	রাজীব চক্রবর্তী	১৪৯
দ্য লাইভস অব আদার্স: মানবতার উপাখ্যান	অঙ্গিরাপ্রিয়া নন্দী	১৫৪
ফ্যাতাড়ুর নজরদারি	প্রীতি দে	১৫৮

তথ্য প্রযুক্তি সামাজিক মাধ্যম

বিগ ডেটা	দেবেশ দাস	১৬৪
নজরদারি পুঁজিবাদ: প্রসঙ্গ যখন ফেসবুক	প্রবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৭১
ট্রোল, ওহ ইয়া	মৃন্ময় মুখার্জি	১৭৬

বিজ্ঞান স্বাস্থ্য রাষ্ট্র

নজরদারির বিরুদ্ধে এক নজর	ডা. স্থবির দাশগুপ্ত	১৮১
বায়ো-মেডিসিন থেকে নজরদারি মেডিসিন	ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য	১৮৭
পুতুল নাচের ইতিকথা: পুঁজির নজরদারি, বিজ্ঞানের নতিস্বীকার?	কঙ্ক ঘোষ	২১২

ই তি হা স রা জ নী তি অ র্থ নী তি

জনমোহিনীবাদ: লক্ষ্য ও উত্থান	রাজমোহন গান্ধি	২২৩
ইতিহাসে নজরদারি: গুপ্ত যুগ কী সুবর্ণ যুগ?	গোপাল চন্দ্র সিন্‌হা	২২৬
নজরদারির অর্থনীতি	সহদেব	২৩২
অর্থনীতি ঢুকেছে কানাগলিতে, মানুষকে পণবন্দি করেছে শাসক	শুভাশিস গুহ	২৪০
নজরদারির সহজপাঠ	মনমিত ভট্টাচার্য্য	২৪৮
আর্য নির্মাণ	সুদীপ্ত ভট্টাচার্য	২৫০
ছাত্র-রাজনীতিতে নজরদারি	অদ্রিজা কারক	২৫৫

আ ই ন আ দা ল ত

আইন যখন সহায়	নির্মাল্য চক্রবর্তী	২৫৮
আইটি রুলস ২০২১: ভারতে ইন্টারনেটের ভবিষ্যৎ ও দুর্ভাবনা	অগ্নীশ্বর চক্রবর্তী	২৬২

প্র তি স্প র্ধা

অ্যারন সোয়ার্তজ: প্রতর্ক, প্রতিস্পর্ধা ও প্রতিবাদ	সৈকত সরকার	২৭৪
নজরে দাঁড়ি: নজরদারির পাঁচালিতে স্নোডেন	সৃজনী চৌধুরী	২৮৫
কয়েকজন নজরবন্দির কথা: ভিন্ন দেশ ও কালের পটভূমিতে	সম্পূর্ণা মণ্ডল	২৯০

লেখক পরিচিতি ২৯৭

প্রথম নজর

প্রকাশ হল অভিক্ষেপ-এর 'নজরদারি' সংখ্যা। নজরদারি চলছে সর্বত্র। আমরা ধরতে চেয়েছি তার শিকড়। বুঝতে চেয়েছি তার বিস্তার। কৈশোর, বয়ঃসন্ধির সময় নজরদারি। নারীর ওপর নজরদারি। ইতিহাসে নজরদারি। নতুন আখ্যান তৈরির অভিপ্রায়। সেই সূত্রে তথ্যপ্রযুক্তির মধ্য দিয়ে পুঁজির বিস্তার এবং তার নজরদারি। শিল্পীর অভিব্যক্তির স্বাধীনতায় নজরদারি। সাহিত্যে, নাটকে নজরদারি। রবীন্দ্রনাথ থেকে ফ্যাতাড়ু। আইন-আদালত থেকে মানবাধিকার কমিশন। এলজিবিটিকিউ নামে পৃথক সমাজ বানিয়ে তার ওপর নজরদারি। ব্যক্তি থেকে সমষ্টি, অর্থনীতি থেকে রাজনীতি। ছাত্র-রাজনীতির ওপর নজরদারি। জনমানসের ওপর জনমোহিনী রাজনীতির নজরদারি। সংখ্যালঘুর ওপর নজরদারি। বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যের ওপর অভিসন্ধির নজরদারি। এবং নজরবন্দি অবস্থায় থেকেও হার না-মানার জেদ। পালটা নজরদারি। এই সমস্ত বিষয় ভিড় করেছে এই সংখ্যায়। আলোচনা হয়েছে। তর্কবিতর্ক হয়েছে। নিরন্তর কাটাছেঁড়া চলেছে। নজরদারি কি তবে কোনও সামাজিক ধ্রুবক? নজরদারি মুক্ত সমাজ কি প্রায় অসম্ভব? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি আমরা।

বেন্থাম, ফুকোর নজরদারি তাত্ত্বিকতার সহজপাঠ বুঝে নিয়ে এই সংখ্যা চেয়েছে আমাদের প্রতিদিনের জীবন জাপটে ঘিরে থাকা নজরদারির কথা বলতে। খুঁজতে চেয়েছে শৈশব থেকে বড়ো হয়ে ওঠার নেপথ্যে নজরদারির অবস্থানগত কৃৎকৌশল।

আমাদের সমাজে, সাধারণত, 'নজরদারি' শব্দবন্ধের সঙ্গে হায়ারার্কি শব্দ ওতপ্রোত। শাসকের নজরদারি। ক্ষমতাসীনের নজরদারি। চিত্তজয় অথবা কারাগার প্রেরণ। এই দুয়ের ওপর ভর করেই ক্ষমতাতন্ত্রের ওপরের স্তর থেকে নীচের স্তরে চলে নজরদারি। গড়ে তোলা হয় শাসকের হেজিমনি। সর্ববিস্তারী প্রভাব। তাই এই ক্ষমতার হেজিমনি ভাঙতে চাই বিকল্প প্রতিরোধী স্বর। নজরদারির এই পিরামিড উলটে দেওয়ার ভাষ্য রচনা করে এক ধরনের 'sousveillance' বা বিপরীত নজরদারি। সামাজিক ক্ষমতার পদসোপানে নীচের স্তর থেকে ওপরের স্তরে নজরদারি। শাসকের প্রতি শাসিতের নজরদারি, রাষ্ট্রের চোখে ছাত্রের চোখ, পুরুষতন্ত্রের রক্তচোখে নারীর অগ্নিস্রাবী দৃষ্টি। সমসাময়িক সমাজ-রাজনীতিতে ভাষ্যের প্রভাব ক্রমাগত তৈরি করছে এক সমবেত নজরদারি। এই ভাষ্যরচনার মূলে থাকে কোনও এক বিশেষ ভাষার দখলদারি। বা কোনও ভাষার মধ্যে কোনও বিশেষ উপভাষার আধিপত্য। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তরের ভাষ্য জাতীয় ভাষ্য রূপে স্বীকৃত হয়ে জনমানসে গৃহীত হয় নিমেষে। শব্দবন্ধের বিস্ফোরণ। সুশীল, আর্বান-নকশাল, টুকরে-টুকরে গ্যাং, হাল্লাবোল, আজাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আবার বিকল্প আখ্যানে হার্ড-ওয়ার্ক (হার্ভার্ড শব্দের বিপরীতে), লোকাল ভোকাল, শরণার্থী প্রভৃতি। শাসকের ব্যক্তিগত ভাষ্য শব্দবন্ধকে রূপ দিতে চায় সামাজিক ভাষ্যের। ধীরে ধীরে তা হয়ে ওঠে মূলস্রোতের ভাষা, জাতীয়তার ভাষা। এই ভাষ্যই ক্রমে

হয়ে ওঠে নজরদার। জরুরি ক্ষমতার বিপরীত ভাষ্যের নজরদারি। শাসকের চোখরাঙানির বিরুদ্ধে প্রয়োজন বিকল্প বয়ানের, বিপরীত নজরদারির নিয়মিত সংঘর্ষ। এই নিরন্তর সংঘর্ষের পাশে অভিক্ষেপ। লড়াই প্রতিরোধী, বিকল্প ভাষ্যের রাস্তা তৈরির। 'রাস্তা কারো একার নয়'।

পাঠকের নিরীক্ষণের সুবিধায় 'নজরদারি'-র ক্ষেত্র কতক উপবিভাগে বিন্যস্ত করা হল। শৈশব থেকে প্রতিস্পর্ধায়, বীক্ষণের নানা মূল্যমানে। বহু চোখ বিচিত্র মন পৃথক অবস্থানে। বিভাজন খানিক স্থূল। কোনও সুস্পষ্ট রেখা নেই। পরিসীমার নজরদারি নেই। যেমনটা জীবনে হয়। পেরোতে হয় অজস্র আবেগের তেপান্তর। তেমনই বিষয়বস্তুর অবারিত চরাচর। সাবলীল যাতায়াত। এক বিভাগ থেকে আর-এক বিভাগে বিভিন্ন সূত্রে অবিরাম যাওয়া আসা। কখনও আশ্চর্য সমাপতন।

অভিক্ষেপ-এর পরিসরে আমরা চেষ্টা করি সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের কথোপকথন তুলে আনতে। সেই লক্ষ্যে 'নজরদারি' সংখ্যার লেখক-লেখিকার বিস্তৃত পরিধির অভিজ্ঞতা আমাদের পথ দেখিয়েছে। ভাষ্যের বৈচিত্র্য আমাদের বড়ো শক্তি। সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক একমুখী স্বর নির্মাণের আগ্রাসী পদক্ষেপের বিপরীতে আমাদের সচেতন অবস্থান। এই সূত্রে উঠে এসেছে নিজ-নিজ পরিসরে কৃতী মানুষ থেকে শুরু করে কলেজ পড়ুয়ার অভিব্যক্তি, গবেষক থেকে গৃহবধূর জবানবন্দি। লেখার গুণমানের (বিচারকমণ্ডল তবু নজর রাখুন) চেয়েও কুণ্ঠাহীন, আনকোরা বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি আমরা। সেক্ষেত্রে সংখ্যাকে সাহিত্যিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে পৌঁছোনোর পরিবর্তে একটি সামবায়িক প্রকল্প রূপে গড়তে মিলেমিশে হাত ধরেছি। প্রশ্রয় দিয়েছি লেখক এবং অভিক্ষেপের একসঙ্গে, পারস্পরিক সম্পৃক্ততায় বেড়ে ওঠার সুযোগকে। চলার পথে অভিভাবক হয়ে পাশে পেয়েছি অজস্র মানুষকে। মাত্র একটি ফোনালাপ বা একবারের অনুরোধে দূরে, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহু মানুষ আমাদের জন্য লিখেছেন। নজরদারির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (পরিবেশ অথবা বুদ্ধিজীবীর প্রতি নজর অথবা বিবিধ) অধরা থেকে গেছে এই সংখ্যায়। কথা দিয়েও কথা রাখতে পারেননি অনেকেই। নানাবিধ বাস্তব সমস্যায় জড়িয়ে পারেননি। তাঁরা অতীতে পাশে ছিলেন। থাকবেন নিশ্চিত। কোভিড আক্রান্ত সত্তরের মা-বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করে রাত তিনটেয় লেখা পাঠিয়েছেন। কথা রাখার দায় যে কম কথা নয়। কেউ কেউ হয়তো বা আটকে পড়েছেন অন্য কোনও নজরদারির ঘেরাটোপে। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

সময় অনুধাবন থেকে আমাদের অবস্থান বুঝে নেওয়ার তাগিদে অভিক্ষেপ। বিকল্প পরিসরে (অবশ্যই তৃতীয়-পরিসর নয়) ব্যক্তি তথা যৌথের প্রতিরোধী প্লাটফর্ম অভিক্ষেপ। সমকাল, মানুষ, জীবন, অসহায় আত্মসমর্পণ, বিশ্বাসঘাতকতার ইতিবৃত্তে বিধৃত অভিক্ষেপ। এবং আছে লড়াই। কেননা, জিজীবিষা বিবমিষার একই উৎসার। 'ইতিহাস শেষ'—ঘোষণায়ও তাই স্পর্ধা জেগে থাকে ক্ষমতার বিপ্রতীপে। আমরা অভিক্ষেপ—শুভাশিস ভট্টাচার্য, সঞ্জীব দাস, সৌম্য মুখার্জি, চয়ন দে, কঙ্ক ঘোষ, মৃন্ময় মুখার্জি। এবং আপনারা। চাইছি সবার বন্ধুতা।

ই-পত্রিকার পরিসর থেকে 'নজরদারি'-কে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন শ্রী সন্দীপ নায়ক। অভিক্ষেপ-এর সুহৃদ তিনি। অভিভাবক। ঋণ অপরিশোধ্য।

মহালয়া, ১৪২৮

সুশান্ত পাল

প্রতিটি শিশুর প্রতি নজর

কুমার রাণা

শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক কেমন হওয়া দরকার? এ নিয়ে বিস্তর তর্ক আছে। একটা তর্ক, এটা মুনাফাহীন ব্যবস্থাপনায় চলবে না মুনাফার ভিত্তিতে? এই তর্কটা অবশ্য খুব পুরাতন নয়, বরং বেশ সাম্প্রতিক বলা চলে, কিন্তু এর প্রাবল্যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তর্কগুলো, বিশেষত শিক্ষার সংজ্ঞা, তার অন্তর্বস্তু ও পদ্ধতি. ইত্যাদির আলোচনাগুলো অনেকটাই চাপা পড়ে গেছে। সে প্রসঙ্গে আমরা আসব, প্রথম তর্কটার চৌকাঠ মাড়িয়ে।

মানব উন্নয়নের মাপকাঠিতে এগিয়ে থাকা সমস্ত দেশেই শিক্ষার দায়িত্ব বহন করেছে প্রধানত সরকার, কিছু ক্ষেত্রে কিছু মুনাফাবর্জিত বেসরকারি উদ্যোগ—নরওয়ে, সুইডেন, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড,সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ নানা দেশে সরকার বহন করেছে শিক্ষার যাবতীয় ভার। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো কিছু ধনী দেশ অবশ্য বরাবর মুনাফার ভূমিকাটা মেনে নিয়েছে—যদিও সরকারি উদ্যোগে শিক্ষাব্যবস্থাও সেখানে আছে। আমাদের দেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশে চলেছে একটা মিশ্র ব্যবস্থা, কিছুটা সরকারি, আর অনেকটাই মুনাফাকামী। এই দুরকম ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠেছে। সরকার পরিচালিত অ-মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানগুলো, প্রধানত, সমাজের দরিদ্র, অসহায় শ্রেণি থেকে আসা শিশুদের আশ্রয় হয়ে উঠেছে, আর বিত্তশালীদের শিক্ষার জায়গা হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মুনাফাভোগী স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি। কিছুকাল আগেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ছিল প্রধানত সরকারের হাতে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান ছিল হাতে গোনা। অধুনা, উচ্চশিক্ষার জগতেও উচ্চবিত্তদের দাপট। এই সূত্র ধরে বলে রাখা দরকার যে, যদিও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটি সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিল, সেগুলোতে আধিপত্য ছিল মূলত উচ্চবিত্তদের। দরিদ্র অংশের ছাত্রছাত্রীরা প্রথমত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলেই পড়ার সুযোগ পেত না, আর যদিও বা পেত, শহরে-বাজারে অবস্থিত এবং তাদের সামর্থ্যের তুলনায় মহার্ঘ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার তাদের প্রায় থাকত না।

এটা আমাদের বহুকাল থেকেই জানা যে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক যেমনটা হওয়া দরকার তার থেকে অনেকটাই পেছনে। কিন্তু এই জানা থেকে তেমন

কিছু উন্নতি সাধন হয়নি বিশেষ করে ভারতবর্ষের কিছু প্রান্তে তো একেবারেই নয়। সরকারি নিয়ম নীতিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বপরিকল্পনা মতো এই সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে নির্বিকার থেকেছে। কিন্তু, ধীরে ধীরে হলেও, এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মাত্রায় হলেও, স্কুল শিক্ষার সুযোগটা খানিকটা ব্যাপক জনসাধারণের নাগালের মধ্যে এল। ফলে তাদের মধ্যে থেকে উচ্চশিক্ষায় যোগ দেওয়ার চাহিদাও কিছুটা বাড়ল। এই পরিবর্তনটি যখন ঘটছে, ঠিক সেই সময়ে দেশে একটা অন্য পরিবর্তনও ঘটে যায়। এটা হল বিশ্বায়িত অর্থব্যবস্থার প্রসারের নামে খোলা-বাজার অর্থব্যবস্থার প্রাধান্য। এককথায় সর্বত্র ফেল-কড়ি-মাখ-তেল ব্যবস্থার প্রবর্তন। সরকারের পক্ষে এটা বেশ খানিকটা সংকটজনক অবস্থা : একদিকে বিনা মূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার নৈতিক, সাংবিধানিক এবং রাজনীতিগত অনুজ্ঞা, আর অন্যদিকে বিশ্বায়িত পুঁজির দাবি ও নির্দেশ। এই চাপের মুখে সরকার যখন একদিকে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ পাশ করছে, তখনই কিন্তু মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও হাট করে দরজা খুলে দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই স্কুলশিক্ষার স্তরে বিত্তবান গোষ্ঠীগুলো মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেছে নিয়েছিল, এবার তারা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই পথ নিতে লাগল। এর বিরাট একটা প্রভাব পড়ল শিক্ষার অর্জনের ওপর। যারা অর্থমূল্যে শিক্ষা কিনছে তারা তাদের পয়সা ষোলো আনা উসুল করে নিতে চাইবে সেটাই স্বাভাবিক। যেটা উসুল করতে চাইবে তার সঙ্গে শিক্ষার সংজ্ঞা বা অন্তর্বস্তুর মিল থাকল কি না তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই, তাদের দাবি, ছেলে মেয়েরা যাতে উপার্জনের বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এর জন্য শুধু স্কুলই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট এক শিক্ষা বাজার গড়ে উঠল, প্রাইভেট টিউশন এবং কোচিং সেন্টারের মধ্যে দিয়ে। সরকার এই ব্যবস্থার সামনে নতজানু হয়ে পড়ল, যার পরিণতিতে সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমে দুর্বলতর হয়ে উঠল।

শিক্ষা তো কারো একার অধিকার নয়, শিক্ষা সর্বসাধারণের। বস্তুত, সর্বসাধারণের শ্রম, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও ত্যাগ থেকেই শিক্ষার নির্মাণ। কিন্তু শিক্ষাকে সর্বসাধারণের সমান আওতায় আনার কাজটা রাষ্ট্রের। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় নীতি সুযোগের সমতার কথা বললেও, কার্যত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নানা বিভাজনগুলোকে নীতিগতভাবেই বজায় রেখে দিয়েছে—যেমন অর্থমূল্যে শিক্ষা ক্রয় করার সুযোগ, কিম্বা সরকারিভাবেই কিছু 'মডেল', 'ভালো' ইসকুল গড়ার উদ্যোগ। আবার নীতির মধ্যে অনেক ভালো ভালো কথা বলা হল বটে, কিন্তু ব্যর্থতার জন্য কাকে কীভাবে দায় নিতে হবে তার কোনও নির্দেশ রইল না। যতদিন নীতির মধ্যে এই উচ্চাবচ থাকবে ততদিন শিক্ষায় সুযোগসাম্যের কল্পনা অবান্তর (বর্তমান শতাব্দীতেই বিহার রাজ্য সরকার নীতির ভিতরকার এই সমস্যা দূর করার জন্য একটি উদ্যোগ নেয়। সেটা ছিল কমন স্কুল সিস্টেম—সব স্কুলে সমান সুযোগসম্পন্ন একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি

কমিশন গঠন। কমিশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার রিপোর্ট পেশ করে, কিন্তু প্রাইভেট লবির চাপে সরকার চুপ মেরে যায়। অথচ, স্কুল ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চাবচ দূর করতে পারলে শিক্ষার সুযোগের যে চিরায়ত বঞ্চনাগুলো আছে সেগুলো দূর করা অনেক সহজ হত—নীতি রূপায়ণের ঘোর সমস্যাটাও খানিকটা কাটানো যেত।)।

এই দুর্বলতা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেকার একটা পুরোনো অসুখকে মারাত্মক রূপ দিল : এ অসুখটা হল শিক্ষার অন্তর্বস্তু, পদ্ধতি এবং গুণমানের সঙ্গে আপস। শিক্ষার সংজ্ঞা হিসেবে মানুষের মনের মুক্তির যে ধারণাটা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, সেই ধারণাটা প্রায় বর্জিত হল। এক কথায় বলতে গেলে, শিক্ষার যে প্রধান দাবি, শিশুর মনের দিকে নজর দেওয়া সেই ধারণাটারই বিলোপ ঘটিয়ে দেওয়া হল। স্কুলে যাওয়ার আগে ট্যুশন, স্কুল থেকে ফেরার পর ট্যুশন, এক মাস্টারের কাছ থেকে আর এক মাস্টারের কাছে ছোটা—এই জাঁতাকলে শিক্ষার্থীর মনের বিকাশের সুযোগ বলে কিছু রইল না। রবীন্দ্রনাথ, সেই ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আমাদের এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন, কিন্তু, সামাজিক-আর্থিক শ্রেণিবিভাগ ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার টান এতই প্রবল যে, শিক্ষাবিজ্ঞান হার মানল, জয়ী হল তথাকথিত বাস্তব চাহিদা।

সে চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম আমরা যে জিনিসটার সঙ্গে সমঝোতা করে বসলাম, তা হল নজর। প্রতিটা শিশুর প্রতি আলাদা আলাদা দৃষ্টিপাত ছাড়া তাদের নিজস্ব বিকাশের পথ খুলে দেওয়া যায় না। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'শিশুর মন' নামক পুস্তিকাতে, রতন লালা ব্রহ্মচারী লিখেছিলেন,

> 'সব ছেলেমেয়ে কখনও সমান নয়। এক এক জনের মানসিক শক্তি এক এক দিকে বেশি পরিস্ফুট হয়। কেহ লেখাপড়ায়, কেহ গানবাজনায়, শিল্পকলায়, কেহ কলকব্জার কাজে অন্য সকলের অপেক্ষা কৃতিত্ব অর্জন করে।... অল্পবুদ্ধি ছেলেদেরও কোন-না-কোন দিকে কিঞ্চিত পটুত্ব থাকে। যেমন সুযোগ না পাইলে প্রতিভার বিকাশ হয় না, তেমনি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সবার ভিতর সবরকম প্রতিভা থাকে না।'

এর পর তিনি একটি মোক্ষম কথা বলছেন,

> 'কোনও বাবা-মা ভাবিয়া রাখিয়াছেন ছেলেকে ডেপুটি করিতে হইবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বেচারার মানসিক শক্তি যা আছে তাহাতে তাহার টিকেট-কালেক্টোর হওয়াই মানায়। এখানে বৃথা তাহাকে গঞ্জনা দিয়া, প্রাইভেট টুটরকে টাকা খাওয়াইয়া বা মাস্টার মহাশয় ও ইউনিভার্সিটিকে অযথা গালাগালি দিয়া কি লাভ? যাহার ভিতর কলকব্জার কাজের প্রতি অনুরাগ ও ক্ষমতা আছে তাহাকে সেই লাইনের জন্য তৈয়ার করিতে হইবে।'

কিন্তু, তা করতে গেলে তো প্রতিটি শিশুর প্রতি আলাদা আলাদা নজর দিতে হবে, তাদের আচরণ,অভ্যাস, চাওয়া, বিতৃষ্ণা ইত্যাদি সমস্ত গুণাবলির প্রতি নজর দিতে হবে এবং সেই নজরের ভিত্তিতে তার পাঠদানের কাজটা করতে হবে। শুধু তাই নয়, বহু শিশুই পাঠে মন দিতে পারে না বলে বকা খায়, মার খায়,এবং শিক্ষার সঙ্গে তার একটা শত্রুতা গড়ে ওঠে। কিন্তু, শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটা যদি মানবিক হয়, মানবিক না হলে